গল্প সংগ্রহ

হরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ওঁর সম্বন্ধে আমার দু'চার কথা

সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঁর চলে যাওয়ার কয়েক মাস আগে থেকেই ওঁর এই চতুর্থ বইটি প্রকাশ করার পরিকল্পনা করছিলাম। কিন্তু উনি তাতে রাজি হচ্ছিলেন না। ওর শর্ত ছিল — বইটি দু'ভাগে থাকবে 'দুই আকাশ' নাম দিয়ে। প্রথম আকাশ হরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'দ্বিতীয় আকাশ' সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় —। কিন্তু সামান্য কিছু অসুবিধার জন্য — এই 'দুই আকাশের' গল্প বাছাই এবং অন্যান্য কাজ খুবই ধীর গতিতে এগোচ্ছিল — কিন্তু তার মধ্যেই নীরবে নিঃশব্দে সব পরিকল্পনা অসমাপ্ত রেখেই উনি বিদায় নিলেন। তাই 'দুই আকাশ' এখন 'এক আকাশ'। ওঁর কিছু গল্প বাছাই করে ছেলে ইন্দ্রনীল, মেয়ে লোপামুদ্রার সহযোগিতায় আমার এই প্রয়াস।

অনেক বছর আগে তিনটি বই প্রকাশ হবার পরও দীর্ঘদিন উনি প্রচুর গল্প, রম্যরচনা, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি লিখলেও বই আকারে প্রকাশ করার উৎসাহ পেতেন না। এর কারণ হিসাবে আমি জানতাম নিঃশব্দ একটা অভিমান কাজ করত ওঁর ভিতরে। সেই কৈশোর থেকে যিনি সাহিত্যের ভিতর মগ্ন ছিলেন, সাহিত্যপ্রীতি যাঁর রক্তে মিশে ছিল, নানা ধরনের পড়াশুনা নিয়ে যিনি জীবনের এতগুলি বছর কাটালেন সাহিত্যজগতের মধ্যে — যাঁর বন্ধুদের তালিকার মধ্যে সবাই জ্ঞানীগুণী মানুষ, বর্ষীয়ান সাহিত্যিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নামি দামি সাহিত্যিক এবং লেখক মানুষরাও — আরও ছিলেন অনেক প্রকাশক এবং পত্রিকার সম্পাদক। তাঁদের কাছে কিছু উৎসাহ এবং অনেক প্রশংসা পেয়েছেন ঠিকই — কিন্তু সেইমতো সুযোগ ও সুবিধা তিনি পাননি এবং বলা ভালো জোর করে নিতেও চাননি। সাহিত্যের ভিতর পত্রপত্রিকার ভিতর যে গোষ্ঠী বা দল তৈরি হচ্ছিল — তার মধ্যে তিনি ঢুকবার চেষ্টাও করেননি কোনোভাবেই। তাঁর মত ছিল সাহিত্যের মানই একজন লেখককে পরিচিতি দিতে পারে। কিন্তু যুগটা যে নিজের ঢাক নিজে পেটানোর— একথাটা মানতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। খুব কাছের ২/১জন বন্ধু ছাড়া নিজের জীবন প্রান্তে এসে কারও সঙ্গেই তার তেমন আর যোগাযোগ ছিল না। যিনি একদিন প্রাণের সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদের জন্য সমস্তরকম লেখক ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখতেন, তার উন্নতির জন্য অফিসের সময়টুকু ছাড়া ব্যয় করতেন ঐ পরিষদের জন্য — বর্তমানে তিনিই হয়ে গিয়েছিলেন প্রায় বন্ধুহারা— শুধু ড. নিমাইসাধন ছাড়া।

তাই তিনি পিছিয়ে পড়েছিলেন। সেখানেই আমার দুঃখ ও ক্ষোভ। এই গল্পসংগ্রহটি বার করার জন্য তাই আমার আপ্রাণ চেষ্টা। সেই চেষ্টা আমার ছেলে ও মেয়ের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো সম্ভব হত না। 'পুনশ্চ' প্রকাশনাকে ধন্যবাদ, তিনি বা তাঁরা আমার স্বপ্নকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন। ড. বসুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী লীনা বসুকে জানাই শ্রদ্ধাসহ ভালোবাসা — তিনি হরিশংকরের একটি পরিচিতি লিখে দিয়েছেন বলে। সবশেষে শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানাই আমাদের ভাগনি শ্রীমতী অন্নপূর্ণাকে যে আমার সঙ্গে থেকে আমায় উৎসাহ আর মনোবল বাড়াতে সাহায্য করেছে।

পাঠকরাই একজন লেখকের প্রকৃত বিচারক। তাঁদের কাছে বইটি যদি ভালো লাগে সেটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার।

সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

স্মরণিকার একটি পাতা

লীনা বসু

হরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাইসাধনের বাল্যজীবনের বন্ধু। হাওড়ার বিবেকানন্দ স্কুলের পড়ুয়া ছিল দু'জনেই। দু'জনেই হাওড়া শহরের মানুষ।

হরিশংকরের পৈতৃক বাড়ি ছিল হাওড়ার কালীকুণ্ডু লেনে। সম্পন্ন যৌথ পরিবারের সন্তান। বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। জাহাজে করে বিদেশ থেকে কাগজপত্র আসত এদেশে বিকোত প্রচুর মূল্যে। পরপর দুটি জাহাজডুবি হল সমুদ্রে আর ওদের পরিবারে নেমে এল বিপর্যয়।

বাড়িঘর-জমিজমা, যা কিছু সম্পত্তি সব হারিয়ে ওরা গিয়ে উঠল আক্রায় (বজবজ লাইনে)। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯৪৬ সালের সারা দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে ওদের জীবনে আবারও নেমে এল বিপর্যয়। পরিবারের সবাই কোনোক্রমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হলেও হরিশংকরের বিশ্বাস, সরলতা ও ভালোবাসার সুযোগে তার এক মুসলমান বন্ধু (?) মাথায় শাবলের কোপ মেরে আর হাত ভেঙে ওকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। পুরো একদিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকার পর কোনও এক সেবা প্রতিষ্ঠান হরিশংকরকে উদ্ধার করে অখ্যাত এক হাসপাতালে পৌঁছে দেয়।

হরিশংকরের এক বিবাহিতা দিদি অসীমা চ্যাটার্জি কোনোরকমে খবর পেয়ে ওঁকে কলকাতায় তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায় — এবং অক্লান্ত সেবাযত্নে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার কারণে তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পড়াশুনার মধ্যেই Burn & Co. -এ কাজ নিতে হয়। কিন্তু স্কুলজীবনের আরম্ভ থেকে যে সাহিত্য-প্রীতি ওর মনের ভিতর বাসা বেঁধেছিল তারই অন্তর্নিহিত আবেগের তাড়নায় তাকে লেখক-শিল্পী করে তোলে — চাকুরি জীবনের বিপরীতধর্মী কাজের মধ্যেও। এর কিছু পরেই বেশ কিছু গল্প বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়। তারও কিছুপর ওর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'টোপর' প্রকাশিত হয়। শিল্পী বন্ধু বিমানচাঁদ মল্লিক বইটির প্রচ্ছদপট এঁকে দেন আর কথাসাহিত্যিক শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় পরিচিতি লিখে দেন বই-এর পৃষ্ঠায়। তারপর বহু গল্প বেরোয় প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতজ্যোতি, সাপ্তাহিক বসুমতী, ঘরোয়া প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

যেহেতু নিমাইসাধন ও হরিশংকর দু'জনেই থাকত হাওড়ায় তাই ওদের সখ্যতায় ছেদ পড়েনি। হরিশংকর বন্ধুকে নিমাই বলে সম্বোধন করলেও আমায় বলত 'লীনা দেবী', Burn & Co.-এ চাকরি করার জন্য পড়াশুনাতে ছেদ পড়ল ঠিকই কিন্তু পড়াশুনা আর সাহিত্যজগতের

মধ্যেই ওর মন সীমাবদ্ধ রইল। পরে চাকুরি জীবনে অবসর সময়ে লেখনীতে হত রীতিমতো নানা চরিত্রসৃষ্টি। গল্পের উপাদান কারখানার যন্ত্রপাতি থেকে এই পৃথিবীর মায়াবী জগৎকেও কেন্দ্র করেই রচিত হত। নিমাইসাধনের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও বিদেশে পি. এইচ. ডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফেরায় কয়েক বছরের ছিন্ন যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তখন St. Pauls, Howrah Girl's College & City College -এর Part time lecturer হয়ে সারা সপ্তাহ ব্যস্ত থাকত নিমাইসাধন।

সপ্তাহের শেষে শনি-রবিবার সাহিত্যচর্চা হবে—এইরকম পরিকল্পনা করা হল। এই সময়ে দুই বন্ধু উদ্যোগী হয়ে গঠন করল 'হাওড়া সংস্কৃতি ও সাহিত্য পরিষদ'। ৫১/১ রামকৃষ্ণপুর লেনের বসু পরিবারের বৈঠকখানায় সাপ্তাহিক আসর বসত, সাহিত্য আলোচনা হত। হাওড়া ও কলকাতার সব সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষ এক হতেন এবং দুটি ঘণ্টা ধরে চলত নানা মনোমুগ্ধকর বিষয়ের আলোচনা। হরিশংকর-ই সমস্ত আসরটির ব্যবস্থা করত। চিঠিপত্র দেওয়া, যোগাযোগ রাখা — লেখক ও সাহিত্যিকদের আসরে নিয়ে আসা ও পৌঁছে দেওয়া ও তার ব্যবস্থা করা তা সে যতই জটিল হোক সমাধান করত হরিশংকর। নিমাইসাধন সঞ্চালকের ভূমিকায় থাকত বরাবর। হরিশংকর এ সব ব্যাপারে বড়োই লাজুক, মাইকটি নিমাইসাধনের মুখের কাছে ধরে ও থাকত পিছনে।

অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির পদে থাকতেন। নিমাইসাধন ও হরিশংকর যুগ্ম-সম্পাদক। শিশুসাহিত্যিক যামিনীকান্ত সোম, কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিল্পী বিমানচাঁদ মল্লিক—এঁরা সকলেই পরিষদের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। বন্ধু শোভন বসুর সঙ্গেও যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায়। নিমাইসাধনের ডাকে সেও আসত কলকাতা থেকে সাহিত্যসভায় যোগ দিতে। বিভূতিবাবুর মূল বাসস্থান ছিল দ্বারভাঙ্গায়। নিমাইসাধন, শোভন বসু ও হরিশংকর প্রায়ই ওঁর আতিথ্য পেত ওখানে গেলে। এর পরবর্তী সময়ে শিক্ষানবিশী করার সুবাদে St. Pauls College -এর ফাদার ফাঁলো, ফাদার আতোয়া এরাও সবাই যোগ দিতেন সাহিত্যসভায় এবং ভাঙা ভাঙা বাংলায় সুন্দর সাহিত্যের আলোচনা করতেন। লেখক মণিশংকর (শংকর), কবি বিষ্ণু দে, সাহিত্যিক মনোজ বসু, গজেন্দ্রনাথ মিত্র সবাই আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন হাওড়াতে। আরও সবায়ের নাম উল্লেখ করা গেল না এটুকু জায়গার মধ্যে — এঁদের সান্নিধ্যে সুন্দর সন্ধ্যাগুলি আমরা সবাই মিলে খুবই উপভোগ করতাম।

স্বনামধন্য পঙ্কজকুমার মল্লিক, কীর্তনীয়া প্রভাসকুমার দে (কৃষ্ণচন্দ্র দে'র ভাইপো) পরিচালিত 'একতারা' প্রতিষ্ঠান থেকে কীর্তন পরিবেশন করেছিলেন। সত্যেন্দু ও মীরা মজুমদারের সঙ্গে শ্রী প্রভাস দের অন্তরঙ্গতা ছিল। এঁদের কাছেই আমার গান শেখা।

ইতিমধ্যে ১৯৫৮ সালে ওদের সংস্কৃত ও সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত এক ছোটোগল্প

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়িনী হয়েছিল বড়িশার বিখ্যাত সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের একটি মেয়ে — সুলেখা রায় চৌধুরী। হাওড়ায় এসেছিল সে পুরস্কার নিতে এবং ওদের পরবর্তী অধিবেশনে গল্প পড়ার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিল। এখানেই ওদের পরিচয় হয় আর তারপর ১৯৬০ সালে বিবাহ।

১৯৬৩ সালে হরিশংকর ও সুলেখা হাওড়া থেকে বড়িশায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বড়িশায় এক অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে হরিশংকর বাড়ি করে। নাম তার 'পত্রপুট'। ওরা এই স্থান পরিবর্তনে খুব খুশি হয় — এবং কর্মস্থল দূরে হয়ে যাওয়াতেও সংসার এবং সাহিত্যসাধনায় মগ্ন হয়ে যায়। যার ফল কিছু আগে ও পরে ওর দুটি বই প্রকাশিত হয়। 'বকুলগন্ধে' আর 'তুমি রবে নীরবে'।

এর মধ্যে নিমাইসাধন ও লীনার একটি নিজস্ব বাড়ি হয়েছে এবং জন্ম হয়েছে পুত্র সুপ্রতীকের। ১৯৬২ সালের মে মাস থেকে রামকৃষ্ণপুর লেনের 'সুতারা'য় ওদের এই সাহিত্যসভা বসত।

এখানেও হরিশংকর-সুলেখা মাঝে মধ্যে আসত ও অনেক সন্ধ্যা বিমল আনন্দে পরিপূর্ণ হত। কিন্তু পুত্র ইন্দ্রনীল খুবই ছোটো থাকার জন্য আর ১৯৬৬ সালে নিমাইসাধন আর লীনা এক বছরেরও বেশি সময় বিদেশে থাকার জন্য সাহিত্যসভা বন্ধ হয়ে যায়। এর কয়েক বছর পর হরিশংকরের কন্যা লোপামুদ্রার জন্ম। এবার ছেলেমেয়ের সুশিক্ষা এবং সৎ মানুষ করার তাগিদে ওরা দু'জনেই সংসারের ভিতর সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দেয়।

নিমাইসাধনও ক্রমশ বিভিন্নভাবে নানা পরিকল্পনা নিয়ে তখন দেশে ও বিদেশে ছুটে বেড়াত। বন্ধুত্বের টান কখনও অস্বচ্ছ হয়নি। আসা-যাওয়া কমে গেলেও দূরভাষের মাধ্যমে যোগাযোগ, হাসি-ঠাট্টা, ওদের দু'জনের সঙ্গে নির্মল বাক্যালাপে বাধা পড়েনি। ১৯৮৮ সালে Burn & Co. থেকে অবসর নিল হরিশংকর আর পরের বছর ডিসেম্বরে উপাচার্য হল নিমাইসাধন বিশ্বভারতীর। পরিবারের বাইরে যারা সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছিল — তাদের মধ্যে হরিশংকর ও সুলেখা অন্যতম।

বড়িশার অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হরিশংকর যুক্ত ছিল। কোনও ক্লাবের সভাপতি, আবার কোনো প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। ওর এলাকায় ও যেমন ছিল জনপ্রিয় তেমনই জনপ্রিয় ছিল "বড়বাড়ি'র জামাই হিসাবে। সবাই ওকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। অনেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল কিন্তু নিজে প্রচারবিমুখ থাকার জন্যই নিজের পরিচয় ভালোভাবে দিতে জানত না।

কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত বিতর্কে সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের তরফ থেকে হাইকোর্টের একটি মামলায় বিশে কমিটির চেয়ারম্যান ছিল নিমাইসাধন। এই বিতর্ক নিয়ে প্রায়ই ওদের পরিবারের

সঙ্গে ও সুলেখার পিতৃগৃহের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বৈঠক ও ইতিহাসের নানা সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে তার একটি বয়ান তৈরি করে হাইকোর্টে পেশ করা হয়েছিল। সদস্যরা ছিলেন — বরুণ দে, অরুণ দাশগুপ্ত, প্রদীপ সিনহা ও সুশীল চৌধুরী। হরিশংকর বন্ধুগর্বে গর্বিত ছিল। বন্ধু বিদেশে পুত্রের কাছে থাকত বলে অভিমানও করত।

২০০৪ সালে হরিশংকর শারীরিকভাবে কিছুটা অসুস্থ হওয়ায় ওদের দেখাসাক্ষাৎ কিছুটা কমে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু নিমাইসাধনের শেষ প্রচেষ্টা — 'সকলের মা মা সারদা' তার সমস্ত ব্যপ্তি নিয়ে হরিশংকরের মন জুড়ে থাকত। সাপ্তাহিক বর্তমান পত্রিকাতে নিমাইসাধনের এই লেখাগুলি তখন প্রকাশিত হচ্ছিল। তার উপর হরিশংকর ও সুলেখার একখানি দীর্ঘ চিঠিও প্রকাশিত হয়েছিল।

হরিশংকরের হৃদয়খানি শ্বেতশুভ্র শতদলের মতো অমলিন ছিল। জীবনে যতখানি তার প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত ছিল বা বাসনা ছিল — তা সম্পূর্ণভাবে তার পাওয়া হয়নি। তারজন্য কারও প্রতি ঈর্ষা, ক্ষোভ বা অভিযোগ ছিল না তার। কিন্তু মনের মাঝে একটা চাপা দুঃখ ছিল, অভিমান ছিল ঠিকই কিন্তু তার মধ্যেই নীরবে নিভৃতে তার সাহিত্যচর্চা চলত এবং ভাগ্যদেবী তাকে সাংসারিক জীবনে যা দিয়েছিলেন — স্ত্রী, ছেলে মেয়ে এবং তাদের সফলতা — তাই নিয়ে হরিশংকর তৃপ্ত ছিল এবং আনন্দময় জীবন যাপন করত।

কিন্তু ২০০৪ সালে নিমাইসাধনের অসুস্থ হওয়া এবং আকস্মিক প্রয়াণ তাকে অত্যন্ত বিচলিত ও ব্যথিত করেছিল — তারও কয়েক বছর আগে থেকেই কিছু প্রিয়জনকে হারানোর ব্যথা তার মনকে বেদনা-বিহ্বল করে রেখেছিল, তার উপর এই বন্ধু-বিচ্ছেদ আকস্মিক বজ্রপাতের মতোই তার মনকে নিদারুণ শূন্যতায় ভরিয়ে দিয়েছিল।

অবশেষে অল্প রোগভোগের পর দুই বন্ধু শোভন বসু ও হরিশংকর তাদের প্রিয়তম বন্ধু নিমাইসাধনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অমর্তধামে যাত্রা করে। সেই দিনটি ছিল ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর।

রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের একটি গীতের বাণী দিয়ে আজ শেষ করি।

"দিন ফুরালো হে, সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী
ভোল সব ভব ভাবনা
হৃদয়ে লহো হে শান্তিবারি"।

সূচিপত্র

বকুলগন্ধে	.....	১৩
সন্ধ্যার মেঘ	.....	২৩
বাবলুর মন	.....	২৮
দাগ	.....	৩৫
মনে মনেই	.....	৪২
মধুর-বেদনা	.....	৪৮
একটি যন্ত্রণার জন্ম	.....	৫৩
একটি হাতের কান্না	.....	৬২
মুক্তির স্বাদ	.....	৭৩
নতুন দিগন্ত	.....	৮২
একটি নতুন বাড়ি ও একটি প্রেমের জন্ম	.....	৮৭
ভুল ভেঙে গেল	.....	৮৯
নাস্তিক	.....	৯৯

মূক ও মুখর ১০২
লাল শাক ১০৪
স্মৃতি ১০৬
নীলকণ্ঠ ১০৯
নদীতে অনেক ঢেউ ১১৭
ওয়েটিংরুম ১২১
লৌকিকতা ১২৪
অসমাপ্ত ১২৮
দিনান্তে ১৩৬
শেষ-মধু ১৪০
অনেক হল দেরি ১৪৪
নিশির ডাক ও প্রতিরক্ষাবাহিনী ১৬৩
ঠাঁই নেই ১৬৫
উদ্বাহ ১৬৭
আমার দেখা মীরাবাঈ ১৭২
এই তো জীবন! ১৭৫

বকুলগন্ধে

ছানিপড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিটা মেলে দিয়ে দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে আছেন সুকুমারী। শরীরটা তাঁর ক'দিনই ভালো নেই। জ্বর জ্বর ভাবটা যেন আজই বেশি মনে হচ্ছে।

ফোঁপরা বকুলগাছটার গায়ে যেন কুড়ুল পড়ছে না—আঘাতটা যেন সরাসরি সুকুমারীর বুকে এসে লাগছে। তরঙ্গ যেমন তটে এসে মাথা খুঁড়ে মরে অনেকটা তেমনি ভাবে। মজুরদের পেশিগুলো সাপের মতো পাকিয়ে উঠছে। কুড়ুলটা মাথার ওপরে উঠে আবার এসে পড়েছে বকুল গাছের বুকে।

অসহ্য! তবু সুকুমারীকে এ আঘাত সহ্য করতেই হবে। অথচ বকুল গাছটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। সে-সব পুরানো দিনের কথা ক'জনই বা মনে রাখে? যারা জানত তারা আজ এ জগতে কেউ বুঝি বেঁচে নেই।

০

বউমারা জেদ ধরল। আর ধরবে না-ই-বা কেন? রাজ্যের দাঁড়কাক এসে বাসা বাঁধল বকুলগাছটার ওপর। দিন নেই, ক্ষণ নেই কেবল শোনো কা-কা রব।

নাতি পলটনের জ্বর হতেই সুকুমারী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। বড়ো ছেলেকে ডাকিয়ে নিজেই ফোঁপরা বকুল গাছটা কাটবার কথা পাড়লেন—মাত্র পরশুদিন কথাটা পাকাপাকি হল আর আজ মজুররা এসে পড়েছে।

দাঁড়কাকগুলো সকাল থেকেই মিত্তিরদের ছাদে আস্তানা নিয়েছে আর সমস্বরে সুকুমারীর দিকে চেয়ে যেন বিদ্রুপ করে পরিত্রাহি ডেকে চলেছে।

সুকুমারী অসুস্থ শরীরে পলটনের কথা ভেবে দাঁড়কাকগুলোর সঙ্গে সমানে চেঁচিয়ে উঠেছেন, রাম—রাম—রাম! ঐ কাকের ডাক শুনে সুকুমারীর বুকটা এখনও ধড়ফড় করে ওঠে। স্বামীর রোগশয্যার কথা মানসপটে ভেসে ওঠে। কতদিনকার কথা, এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে।

সেদিন হুলো বেড়ালটা কী ডাকই না ডেকেছিল! সেই অলক্ষুণে ডাক শুনে রোগশয্যাতে স্বামীর হাত দুটো চেপে ধরেছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। এখনও বেড়াল-ডাক শুনলেই অজানা ভয়ে সুকুমারীর শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দাঁড়কাকের ডাক শোনবার পর থেকেই সুকুমারীকে অজানিত আশঙ্কায় পেয়ে বসেছিল। সংসারের মঙ্গলকামনা তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো জিনিস। কতকগুলো কাককে শাস্তি দেওয়ার জন্য সুকুমারীর সাধের

বকুলগাছটা চলে যাচ্ছে; আর তার সঙ্গে চলে যাচ্ছে এবাড়ির বৃদ্ধার বেশ-কিছুটা সত্তা। কে বিশ্বাস করবে ঐ বকুলগাছটার জন্যে একটা রক্ত-মাংসের মানুষ আজ তিনদিন ধরে গোপনে অশ্রুজল ফেলেছেন? কেউ বুঝবে না। বুঝতে চাইবে না। বাইরের সবকিছু এখন সুকুমারীর দৃষ্টিপথ থেকে সরে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে দৃষ্টির অন্তরালে— আর ঠিক সেই সঙ্গেই আজ তিন দিন সুকুমারীর আর একটি দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে। মানস দৃষ্টি!

কিন্তু অন্তর্দাহকে তো চাপা দেবার কোনো উপায় নেই।

শ্বশুরবাড়ির চারিদিক ছিল জঙ্গলে ঘেরা। দিনের বেলা জঙ্গলের দিকে তাকালে গাটা কেমন যেন ছমছম করত। সুকুমারীর বয়স তখন কত হবে? বড়োজোর দশ বছর। এখনও সুকুমারীর সব কথা মনে আছে। পায়ের মল পরে লালপেড়ে খাটো-শাড়িটা পরে বকুল ফুল তুলছিলেন—আর জমিদারবাড়িতে চিকের আড়াল থেকে দেখা 'কৃষ্ণ-পালা'র একটা গানের কলি তুলছিলেন গুন গুন করে। হঠাৎ সুকুমারীর পিসিমা তাঁকে ধরে এনেছিলেন অন্দরে। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে যেতে হয়েছিল বৈঠকখানায়।

শ্যামলালবাবুর মেয়ে দেখেই পছন্দ হল। আড়তদার মানুষ, রাত থাকতেই কেনাকাটায় বেরিয়েছিলেন—গিন্নির গঞ্জনার কথা সারাটা রাস্তা তাঁর বুকে বিঁধে ছিল। তাই অনেক দিনের কথা দেওয়া মেয়েটিকে সরাসরি ভোরেই দেখতে এসেছিলেন। সেই সুন্দর ভোরবেলার কথা সুকুমারীর এখনও স্পষ্ট মনে আছে। প্রজাপতিগুলো ক'দিন থেকেই তাঁর মাথায় বেশি বসেছিল, সখিদের তাই নিয়ে কী রসিকতা! শ্যামলালবাবু পছন্দ করে চলে গেলেন, তারপর সখিরা ঘিরে ধরেছিল। সখিদের আনন্দ-ভরা মুখগুলো এখনও সুকুমারীর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। চোখ বুজলেই এখনও সে-সব হারিয়ে-যাওয়া মুখ একে একে এসে ভিড় করে। সেই দিনগুলোই শুধু তাঁর কাছে ধরা আছে। মানুষগুলোর কোনো হদিস নেই।

দাঁড়কাকগুলো একটু আগে একপশলা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। উড়তে পারছে না। কেবল ডানা-ঝটপটানি শোনা যাচ্ছে মিত্তিরদের বাড়ির ছাদ থেকে। মজুররা বকুলগাছটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। এইবার গাছটা দক্ষিণমুখো ফাঁকা জায়গাটাতে হুড়মুড় করে পড়বে। গাছটাকে আর একবার শেষবারের মতো দেখবার ইচ্ছা হল সুকুমারীর। ঐ গাছের একটা ডালে দোলা খাটানো থাকত। দড়ির ঘষটানি লেগে ডালে দুটো দাগ পড়েছিল। একটু তফাতে দুটি দাগ। ডালটাকে মনে হত নধর একটি হাত। মাঝে মাঝে দড়ির দাগগুলোকে সুকুমারীর মনে হত অনেক কিছু। বকুল গাছ যেন পুষ্ট হাতে দু'গাছি বালা পরেছে। মনে পড়ে সুকুমারীর। একবার স্বামী কাপড়-চোপড় টাঙাবার জন্য একটা দড়ি খাটিয়ে দিয়েছিলেন। হুকের মাথাটা বকুল গাছের বুকে যখন গিয়ে বিঁধেছিল তখন থেকে একটা রস সারাদিন চুইয়ে চুইয়ে পড়েছিল। সুকুমারীর মনে হয়েছিল গাছ যেন কাঁদছে। গাছেরই চোখের জল যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে।

আশীর্বাদ হল। গায়ে-হলুদের পর্বও চুকে গেল। রাত্রিতে ইংরেজি বাজনা বাজিয়ে বড়ো বড়ো মশাল জ্বালিয়ে ওরা, মানে বরযাত্রীরা, বজরা থেকে নামলেন। দশ বছরের সুকুমারীর চোখে তখন রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছে। বড়ো কাপড়টা পরে যেন বেশি জবুথবু হয়ে গিয়েছিলেন। সারাটা মুখ চন্দনের ফোঁটায় একাকার হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাদির কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

তারপর মশালের তীব্র আলো, শাঁখের আওয়াজ আর ইংরেজি বাজনার মধ্যে ঘুমঘুম চোখে সুকুমারী জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রখর আলোতে প্রথমেই বাড়ির বকুলগাছটাকে দেখতে পেয়েছিলেন। গাছের নীচে কে যেন সাদা চাদর একটা বিছিয়ে রেখেছিল। বরযাত্রীর পায়ে পায়ে দলিত হয়ে ফুলের গন্ধ, মশালের তেলপোড়া গন্ধ, আতসবাজির গন্ধ সব মিলিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল। পালকি-বেয়ারা একসুরে গান গেয়ে চলেছিল।

বৃন্দাদি বলেছিলেন, ঐ পালকিতেই নাকি সুকুমারীর বর আছে। তারপর সবাই একে একে চলে গিয়েছিল বাগানবাড়িতে। অন্ধকারের জালটা আবার ঘিরেছিল জায়গাটাকে। আবার জোনাকির দল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দিয়েছিল। টিপ টিপ করে জ্বলেছিল। বরযাত্রীরা যাবার সময় গ্রামের কুকুরগুলো পিছনে পিছনে খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, শেষে তারাও এদিক-ওদিক মিলিয়ে গিয়েছিল। বরযাত্রীদের ছায়াগুলো দিঘির শান্ত-জলে ভেসে উঠেছিল, কিছু পরে সব চুপচাপ, ঠিক তখন দীঘির কালো জলটাকে যেন কালো মসৃণ বিরাট একটা সরীসৃপ বলে মনে হয়েছিল।

বকুল গাছটা সশব্দে পড়ল। সুকুমারী হঠাৎ চমকে উঠলেন। আওয়াজ শুনে দাঁড়কাকগুলো আর একবার তীব্রস্বরে ডেকে উঠল, কা—কা—কা—।

শেষে কুশণ্ডিকার পাঠ চুকল।

পালকি করে সুকুমারী এলেন শ্বশুরবাড়ি। স্বামী সারাটা রাস্তায় মাত্র দুটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন—তারপর চুপচাপ। আর সুকুমারীর মন কেঁদে উঠেছিল—বৃন্দাদির কথা ভেবে, সই কমলার কথা ভেবে, ছোটো ভাই রাখালের কথা ভেবে, বাড়ির বুদি গাইটার কথাও মনে পড়েছিল। আর মনে পড়েছিল দিঘির কথা, বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে যে চাঁদটা উঠত তার কথা। খুকির মাকে সঙ্গে দিয়েছিলেন সুকুমারীর মা। পালকিটা যখন মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ তলায় রাখা ছিল—বেয়ারাগুলো দা-কাটা তামাকে মৌজ করে সুখে টান দিচ্ছিল—ঠিক তখন খুকির মা এসেছিল সুকুমারীর কাছে।

কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সুকুমারী। এতদিন পরেও খুকির মার মুখটা হুবহু মনে পড়ল সুকুমারীর। শেষে পালকি এসে দাঁড়াল শ্বশুরবাড়ির দরজায়। শাশুড়ি তো বউ দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন, তাই দেখে সুকুমারী কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষটাকে চিনতে একটুও দেরি হয়নি সুকুমারীর। পালকি থেকে নামিয়ে সুকুমারীকে চুমু খেয়েছিলেন, আর সুকুমারীর মনে হয়েছিল যেন নিজের মার বুকেই ফিরে এসেছেন।

তারপর ঠিক বকুল গাছটার নীচে এসেছিলেন। কী অদ্ভুত মিল! বাপেরবাড়ির গাছটার সঙ্গে এখানকার গাছটার কী সাদৃশ্য! সুকুমারীর সেদিন মনে হয়েছিল বাপের বাড়ির গাঁ-টাকে কে যেন শ্বশুরবাড়িতে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দুধে-আলতার থালায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সুকুমারী, আর টুপটাপ দু'একটা ফুল মাথায় ঝরে পড়েছিল। সেদিন থেকেই বকুল গাছ সুকুমারীর সত্তার সঙ্গে এক হয়ে আছে। সে কি আজকের কথা!

দু'দিন পরে কিন্তু সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্বামী পড়বার জন্য শহরে চলে গেলেন। ননদ কুসুমকুমারীকে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল সুকুমারীর। কোথায় কুসুমকুমারী চলে গেলেন? কুসুমকুমারীর কথা ভাবতে ভাবতে যুগপৎ হাসি আর অশ্রু একসঙ্গে দেখা দিল সুকুমারীর মুখে আর চোখে। রান্না-রান্না খেলা, দশ-পঁচিশ খেলা, অষ্টা-কষ্টি খেলা, কড়ি-কড়ি খেলা হত। ঐ ফোঁপরা বকুল গাছটার নীচে শান-বাঁধানো চাতালে বসে দুই ননদ-ভাজে কত সুখদুঃখের কথাই না হয়েছে। কে তার হিসাব রাখে? এসব ভাবতে ভাবতে এক সময় সুকুমারী নিজের মনেই হেসে উঠলেন। কুসুমকুমারীর অতীত দিনের কথা ভেবে তাঁর মুখে আজ হাসি আসছে। খুব দস্যি মেয়ে ছিলেন কুসুম। ঘুমন্ত শাশুড়ির আঁচল থেকে চাবি নিয়ে ভাঁড়ারঘর খুলত কুসুমকুমারী। বয়ামে থরে থরে আচার সাজানো থাকত। সেই আচার এক খাবলা তুলে এনে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসতেন কুসুমকুমারী। কিন্তু এত হাসি, এত আনন্দের মধ্যেও সুকুমারীর মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেত। বাপের বাড়ির জন্যে প্রাণটা আনচান করে উঠত। এখনকার মেয়েদের মতো স্বাধীনতা ছিল না। কাপড় শুকাতে দেবার ছল করে ছাদে এসে দাঁড়াতেন সুকুমারী। বাপের বাড়ির দিকের আকাশটার মাঝে কী খুঁজে পেতেন তিনিই জানেন, অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। মাঝে মাঝে পথ-চলতি মানুষগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। যদি বাপের বাড়ির কোনো পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। রাতে কুসুমের গলা জড়িয়ে এক বিছানায় শুতেন, কুসুমের খুনসুড়ির মাত্রা মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে যেত। তবু কুসুমকে মনে হত আপন মায়ের পেটের বোন।

পিঠের শিরদাঁড়াতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে সুকুমারীর। চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। গলায় যেন মরুভূমির তৃষ্ণা। পাথরের বাটি থেকে ঢক ঢক করে জল খেলেন সুকুমারী।

তারপর?

একদিন বাবা নিতে এলেন সুকুমারীকে। বাপের বাড়ি যাবার আগের দিন সুকুমারীর ঘুম আসেনি। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে কী উত্তেজনা! এ উত্তেজনা সব মেয়েরা বোঝে। একান্ত স্বাভাবিক। কুসুমের বিয়ে হয়ে গেল সেই কোন দূর দেশে। তারপর একদিন সুকুমারী নিজের চেহারাটা ভালো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। নিজের শরীরটাকেই শুধু দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন বিশ্বের অনেক কিছু অবিদিত জিনিস।

শুধু কি শরীরটাই পরিবর্তন হয়েছিল? আর মন? মনের গহনে স্তরে স্তরে ভেসে উঠেছিল নতুন সুরের ছন্দ। কোকিলের স্বরকে মনে হত কত মিষ্টি। নিজের গলার স্বর

নিজের বলেই মনে হত না নিজের কাছে। গা-হাত-পাগুলো কত ভারী ভারী হয়ে গেল। চলনে হারিয়ে গেল পূর্বের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। একটু রসিকতার কথা শুনলে মনে হত রাজ্যের রক্ত তার মুখে এসে জমা হয়েছে। মাতামাতি শুরু করেছে।

ভাঙা তোবড়ানো গালে, মাথার ছোটো ছোটো চুলে হাত বুলিয়ে দেখলেন সুকুমারী। হ্যাঁ, চুল ছিল বটে সুকুমারীর। পাড়ার মেয়েরা চুলের কথা হলে সুকুমারীর চুলের কথা এনে ফেলতেন। নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার আর শেষ ছিল না। কোন অঙ্গকে বাদ দেবেন? কোন অঙ্গের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করবেন?

মাথায় চিরুণি, নাকে নোলক, গলায় হেলে হার, কোমরে গোট, হাতে চুর-চুড়ি, বাউটি, তাগা, বাজু, কানে গোকরি মাকড়ি নয়তো ইহুদি মাকড়ি। এ সব পরে কী সুন্দর দেখাত সুকুমারীকে!

বউমাদের সেই যৌবনকালের মধ্যে এনে বিচার করেন সুকুমারী। রোগ লেগেই আছে। আজ এ-হাসপাতাল কাল সে-হাসপাতাল। অথচ পাস-করা বউমাদের গর্বে সুকুমারীর বুক ফুলে ওঠে। বউমারা গড় গড় করে টেলিগ্রাম পড়তে পারে, মোটা মোটা বই পড়িয়ে শোনায়। কিন্তু বউমাদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকার জন্য সুকুমারী বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।

পৃথিবীর সব কিছু একটু একটু করে ভালো লাগতে লাগল সুকুমারীর কাছে। সেই মানুষটার জন্যে মনটা আনচান করে উঠত। বিকালে চুল বাঁধার পর মা যখন সিঁথিতে, হাতের চুড়িতে সিন্দূর পরিয়ে দিতেন, মাকে প্রণাম সেরে সুকুমারী কেমন যেন উদাস হয়ে পড়তেন। এবার কলকাতার দিকের যে আকাশ সেই আকাশটার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন। কোথায় কোন দূরে স্বামী আছেন তাঁর কথা মনে পড়ত। সুকুমারীর মনটা ঘুরে-ফিরে বেড়াত নাম-না-জানা শহরের আঁকা-বাঁকা রাস্তায়। কল্পনার অঞ্জন চোখে পরে স্বামীর ধ্যান করতেন। বিয়ের পর মানুষটাকে ক'দিনই বা দেখেছিলেন, কেবল পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। স্বামীর মুখের প্রতিটি রেখা তবু সুকুমারীর অচেনা লাগত না। মেয়েরা একবার যে মুখ মন-প্রাণ দিয়ে দেখে নেয়, সে মুখ তারা কোনোদিন ভোলে না।

তারপর কোনো এক বকুল-ঝরা চাঁদনী রাতে স্বামী ফিরে এলেন। দুটো পাস করা স্বামী। মনটা একটু দুলে উঠল সুকুমারীর। কুসুম তখন ছিলেন। একটা বকুল ফুলের মালা গেঁথেছিলেন নিজের মনের অজান্তে।

তাই নিয়ে কুসুমের সে কী রসিকতা, ওলো ভেতরে ভেতরে এত!

মালাটা কেড়ে কুসুম চেঁচাতে যাবেন ঠিক তখনই কুসুমের মুখটা চেপে ধরেছিলেন সুকুমারী।

খুব প্রাণখোলা মেয়ে ছিলেন কুসুম। প্রথম প্রথম কুসুমের স্বামী নাকি কুসুমকে নিয়ে ঘর করতেন না। এ খবর সবাই জানত, কিন্তু কুসুম জেনেও জানতে দিত না। ভারি দুঃখ হত কুসুমের জন্য। বেচারিকে বছরের বেশি সময় বাপের বাড়িতেই থাকতে হত। কিন্তু শেষে একদিন সব ঠিক হয়ে গেল। কুসুমের জীবনে আবার শান্তি ফিরে এসেছিল।